স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

জানুয়ারি ২০১৭

প্রতিযোগিতার রণভূমি পরিণত হোলো উৎসবের মিলন প্রাঙ্গনে

ওরা এসেছিল প্রতিযোগিতায় জিততে, ফিরে গেল উৎসবের মেজাজে। পরস্পর আলিঙ্গনে টাটা বাই বাই শব্দে মুখরিত হলো সেন্ট জনস্ স্কুলের ক্রীড়া প্রাঙ্গন।

গত ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৬ রবিবার হুগলীর ব্যাণ্ডেল চার্চের বিপরীতে সেন্ট জনস্ স্কুলে স্টুডেন্টস হেলথ হোম নর্থ হুগলী আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালনায় শেষ, হলো স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ২০১৬ উৎসব। সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে এসেছিল প্রতিযোগীরা। কয়েকশো প্রতিযোগীর কাকলিতে মুখরিত হলো স্কুল প্রাঙ্গন। স্টুডেন্টস হেলথ হোম প্রযোজিত ডাঃ পবিত্র গোস্বামীর পরিচালনায় একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য হাতে হাত ধরে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করলো ছাত্র ছাত্রীরা। এরপর শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করলো সেন্ট জনস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এরপর স্বাগত ভাষণে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তৃষিতানন্দ রায় ব্যাখ্যা করলেন ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কি করে উৎসবের রূপ ধারণ করলো। তিনি বলেন ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য এই উৎসব। তিনি বলেন রোগের চিকিৎসা করার চাইতে রোগ প্রতিরোধের পথ খুঁজে বের করা এবং ছাত্রছাত্রীদের সেই শিক্ষা দেওয়াই বর্তমানে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রধান কাজ। উদ্বোধনী ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার ছাত্র জীবন থেকে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলেন, খড়্গপুরের দুজন ছাত্রের T.B.-র চিকিৎসা করে তাঁদেরকে সুস্থ করেছিলো স্টুডেন্টস হেলথ হোম। ক্রীকরোর ছোট্ট ঘর থেকে ডাঃ অরুণ সেনের পরিচালনায় পরিচালিত হোতো স্টুডেন্টস হেলথ হোম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আজকের মৌলালী মোড়ের স্টুডেন্টস হেলথ হোম। স্থানীয় বিধায়ক শ্রী অসিত মজুমদার হেলথ হোমের কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করে বলেন হেলথ হোমকে সাহায্য করতে পারলে তিনি খুশী হবেন। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। অন্য একটি ঘরে উপস্থিত অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে মৃগী রোগের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তৃষিতা নন্দ রায় এবং ডাঃ সমর বিশ্বাস। প্রতিযোগিতা শেষে উদ্বোধন মঞ্চ থেকে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়। এর পর বিদায়ের পালা, অশ্রুসজল চোখে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলো ক্ষণিকের বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করার অঙ্গিকার নিয়ে।

আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্যদিবস —১০ই অক্টোবর

ডাঃ বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WTTO) স্বাস্থের সংজ্ঞা হল—"স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতি নয়—শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থবোধের নামই স্বাস্থ্য।" বিশ্বে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে বেড়েছে হতাশা, অবসাদ। বিবিধ দূষণের কারণে সমাজে এসেছে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগ। যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের জীবনাচিত স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাস বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই জন্য বিশ্বে মানসিক রোগের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

আমেরিকার কয়েক লক্ষ মানুষ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাস জুড়ে মানসিক রোগ অবহিতের জন্য মনন ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে গড়ে তোলে Mental Health America সংস্থা।

১৯৯০ সালে মানসিক রোগ প্রতিরোধের জন্য সমাজে এব্যাপারে সচেতন করার কাজে Mental Health Awareness পালন করা হয় 30th March থেকে 5th April পর্যন্ত। ১৯৯২ সালে World Federation of Mental Health সারা বিশ্বব্যাপী ১৫০টি দেশে ১০ই অক্টোবর প্রথম World Mental Health Day পালন করে। মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের প্রতিরোধের বার্তা বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় ঐ সংগঠন। "নীতিমূলক বাণী" (Slogan)-কে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী মানসিক রোগ ও তার ভুক্তভোগীকে নিয়ে প্রতি বছর প্রচার করা হয়। ২০১৬ সালের Slogan হল—"Dignity in Mental Health"। ২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের বিষয়বস্তু হল—সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক রোগী সম্বন্ধে সাহায্য ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে তোলা, মানসিক রোগ সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ও অপবাদজনিত ধারণা দূর করা ও তাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো।

সমাজ ও সংসারে সহানুভূতি প্রদান করলে ও রোগের চিকিৎসা পেলে "SCHIZOPHRENIA" রোগের শিকারগ্রস্ত মানুষ সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম—এই ছিল ২০১৪ সালের বিষয়বস্তু। ২০১৩ সালে বয়স্ক মানুষের মানসিক সমস্যাকে তুলে ধরে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার মানসিকতা বৃদ্ধির কাজ হয়েছিল। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে হতাশার (Depression) উৎস, প্রতিকার ও উপশম নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু হয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যৌথভাবে সমীক্ষা করে জানায় যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সমস্যার শতকরা ১২ ভাগ মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। এই সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে এবং এই কারণে বিশ্বের অর্থনীতিতে ও প্রচণ্ড প্রভাব পড়ছে।

আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্যদিবস আহ্বান ও দাবি জানাচ্ছে যে, নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থ ও সতেজ রাখার স্বার্থে সমগ্র বিশ্বের উন্নয়নের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশ ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সাধারণত ১০ বৎসর বয়স থেকে ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে ধীরে ধীরে দৈহিক বৃদ্ধি-বিকাশ ও যৌনতার পরিপূর্ণতা ঘটে। সেইসঙ্গে পরিবার থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার মানসিকতা ও স্বমূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে মানসিক পরিবর্তনের কয়েকটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়—যেমন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, আবেগজনিত লক্ষণের বিকাশ, নানাবিধ সম্পর্ক ও সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান ও তথ্য অনুযায়ী। মৃত্যুর প্রথম ১০টি কারণের মধ্যে মানসিক ব্যাধি অন্যতম। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অহেতুক মনোবেদনা জন্ম দেয় মানসিক অবসন্নতা। সদগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা জীবনের ধনাত্মক দিকগুলি অটুট ও অক্ষত রাখে। অধিক অর্থলোভ, অহংকার, কুসংস্কার ও ভাগ্য নির্ভরতা, হিংসা, ঈর্ষা-দ্বেষ মানুষের মনকে অধঃপতিত এবং অবনমিত করে থাকে। গীতার কথায়—"কর্তব্যেধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—অর্থাৎ ফলের আশা না করিয়া কর্তব্য করিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। নিষ্কাম কর্ম করাই এই বন্ধন থেকে মুক্তির পথ। তবেই মানসিক ভারসাম্য অটুট থাকবে। সেই সাথে মন ভালো থাকলে শরীর ও সমাজ সুস্থ থাকবে। ব্রেনের স্নায়ুর রাসায়নিক পদার্থ বাড়া কমার কারণে—যেমন, সেরোটোনিন, জেপানিন ইত্যাদি ব্রেনের সাইনাপটিক ক্লেফটে নিঃসৃত হওয়ার সময়ে স্বাভাবিক পরিমাণ থেকে কখনও কখনও কমে যায়, আবার বেড়েও যায়, তার ফলে এই মারাত্মক মানসিক অবসাদজনিত ব্যাধির শিকার হন মানুষ। উপসর্গ বা লক্ষণগুলি হল—দৈনন্দিন কাজও খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অনীহা, কম-বেশি ঘুম, চোখের কোনে কালি পড়া, বারবার হাত ধোয়া, বেঁচে থাকার ইচ্ছে কমে যায় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। বয়স্ক মানুষেরা স্মৃতিভ্রংশ (অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার-"ওসিডি") রোগে আক্রান্ত হন। তাছাড়া মানসিক রোগীদের অপরাধী মন বুঝতে এখন মনোবিদ দরকার। মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য রোগীর বাড়ির লোকের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। তাহলেই দ্রুত মানসিক রোগটিকে সুস্থ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে—তবেই সার্থক ও সুন্দর হবে আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এবং মানবসমাজ ধরায় হবে ধন্য।

জাতীয় মৃগী-দিবস

ডাঃ তাপস কুমার ঘোষ

ছোটবেলার কথা। পাশের পাড়ার একটা ছোট-দিদি ছিল। মাঝে মাঝে সে অজ্ঞান হয়ে যেতো। সবার মুখে শুনতাম, দিদিটা খুব মেধাবী মেয়ে ছিল। তার বাবা-মা কান্নাকাটি করতো। একদিন পুকুরে পড়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল দিদিটা।

ছোটবেলায় এ ধরনের কাহিনী সবাই কমবেশী শুনি। কোনও কোনও মানুষ কিছুক্ষণের জন্য নিঃঝুম বাকরোধ হয়ে যায়। কেউ বলে ভূতে ধরেছে। কেউ বলে সন্ন্যাস রোগ। কিন্তু তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হত বলে শুনিনি।

সভ্যতার অগ্রগতি কিন্তু অনেক কিছুর বদল এনেছে। আজ দেখি কোনও বন্ধুর ছেলে বা মেয়ে মৃগীরোগ ভুক্তভোগী হয়েও, উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। নিয়মিত শুধু সেবন করে ও প্রয়োজনীয় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে সুস্থ জীবন যাপন করছে।

মৃগী বা epileping এক শারীরিক অসুস্থতা, যে রোগে তড়কা বা খিঁচুনি (Seigures) হওয়ার প্রবণতা থাকে।

মস্তিষ্কের রোগের সংখ্যার নিরিখে store বা সন্ন্যাসরোগের পরই exileping বা মৃগীরোগ। অল্পবয়স্ক বা বৃদ্ধ বয়সের মানুষের মধ্যে এই রোগ বেশী হয়।

কোনও মানুষের তড়কা বা convulsion হলে মাথায় CT Scan এবং EEG (Electro Encephalogram) প্রয়োজনে মাথার MRI করানো হয়। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের মতামত জরুরী। মস্তিষ্কের রোগ হলেও মৃগীরোগ সাধারণতঃ বুদ্ধিবিকাশের অন্তরায় নয়। অথচ মৃগীরোগ ও মৃগীরোগী সম্বন্ধে সমাজে নানা ভীতিমূলক মিথ্যা ধারণা রয়ে গেছে। এই রোগ সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ও অবৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা এইরকম যে, এরা কোনও দিন সাইকেল বা গাড়ী চালাতে পারবে না। এক মৃগী রোগীর রক্ত অন্য মানুষের দেহে গেলে আরও মৃগীরোগ হবে। মৃগীরোগীদের শিক্ষক, নার্স প্রভৃতি পেশায় যাওয়া ঠিক নয়। আলোর মধ্যে গেলে মৃগীরোগীদের তড়কা হবে। এ ধরণের বিভিন্ন ভুল ধারণা মানুষ অবৈজ্ঞানিকভাবে মনগড়া চিন্তা দিয়ে সমাজে প্রচার করে। আর তাই, সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনে মৃগীরোগীরা বাধা পায়। অথবা আর পাঁচটা অসুখের মতো মৃগী রোগও একটা অসুখ। নিয়মিত চিকিৎসায় স্বাভাক জীবনযাপন করতে পারে।

মস্তিষ্কে তড়িৎচালনার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বিশৃঙ্খল তড়িৎপ্রবাহ এরোগের বৈশিষ্ট্য। মৃগীরোগের কারণ নানাবিধ। জন্মগত বা জিনঘটিত কারণ। জন্মের সময় মাথায় আঘাত জনিত কারণ। মস্তিষ্কে নানাবিধ বীজানুর সংক্রমন। শরীরের জৈবিক পদার্থের (metabolic) অভাব বা বৃদ্ধি। এর কারণ। আবার অজানা কারণেও মৃগীরোগ হতে পারে। সঠিক চিকিৎসার অভাব। অনিয়মিত ওষুধ সেবন, নিয়মিত পরীক্ষা না করলে জটিলতা দেখা দিতে পারে। ১৯৬৯ সাল থেকে আমাদের দেশে নভেম্বর মাসকে মৃগী রোগ সচেতনতার মাস হিসাবে, এই রোগের প্রতিরোধের কাজ চলে। নিয়মিত ওষুধ সেবন, পুরোমাত্রায় বিশ্রাম ও নিয়মিত ঘুম এবং মদজাতীয় নেশা যুক্ত জীবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। যাতে মৃগীরোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। ১৯৯১ সাল থেকে ১৭ই নভেম্বরকে জাতীয় মৃগী দিবস হিসাবে গণ্য করা হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় সূর্যের আয়নকাল একুশে জুনকে জাতীয় মৃগী-দিবস রূপে চিহ্নিত করা হয়। সাউথ আফ্রিকায় শীতের সেই দিন সবচেয়ে ছোট সময়ের আর রাত সবচেয়ে বড়। মৃগী রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার অন্ধকারকে বিজ্ঞান আর যুক্তির আলো দিয়ে দূর করার উদ্দেশ্যে ওই দিন বেছে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ মৃগী ভুক্তভোগী। ঠিক ঠিক চিকিৎসা হলে, তারাও অন্যদের মতো সব ধরণের পেশায় স্বাভাবিকভাবে সমফলতার দিকে এগোতে পারে। এ রোগ কোনও দিক দিয়েই প্রতিবন্ধক নয়। অথচ সমাজে, মানুষের বুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, এদের প্রতি অবজ্ঞা— এই মানুষদের হতাশ করে, বিভ্রান্ত করে। সমাজের মূলস্রোত থেকে দূরে রাখে। এইসব রোগীর মধ্যে হতাশা রোগকে জটিল করে।

তাই মৃগীরোগীর সঠিক রোগ নির্ণয়। সঠিক চিকিৎসা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সাথে সমাজের মধ্যে এরোগ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা দরকার। তবেই শত মৃগী রোগীর মুখে ফুটে উঠবে হাসি।

মানুষ সুকান্ত

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

পনের আগষ্ট, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই দিনটির অপরিসীন গুরুত্ব। স্বাধীনতা দিবস, আরো কত কি। কত কিছু করি আমরা এই দিনটিতে। সারা দিন। সারাদিন আমরা দেশ গান শুনি, দেশ বন্দনা করি। এই একটা দিন সকলেই চেষ্টা করি দেশপ্রেমিক হতে, দেশকে ভালবাসতে দেশকে শ্রদ্ধা করতে। কিন্তু, এত আলো রোশনাই এর মাঝে এত জাঁক-জমক এর মাঝে, আমরা একবারও চিন্তা করিনা, যে ভারতবর্ষের কট্টর স্বদেশবাসী একজন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৯২৬ সালের এই দিনেই। বাংলা তারিখটা ছিল ৩০ শে শ্রাবন, ১৩৩৩।

মাসটা শ্রাবণ। বাঙালীর কাছে এই শ্রাবণ মাসটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কারণ এই শ্রাবণই বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তাঁদের আর এক অতি প্রিয় কবিকে— সেটা অবশ্য কয়েক বছর পরে। এই শ্রাবই ১৯২৬ এ আমাদের এনে দিল এক অসামান্য প্রতিভাবান কবিকে, আবার এই শ্রাবণ-ই, তার বাদলধারার সাথে বাঙালীর চোখের জলকে একাকার করে, কেড়ে নিল বাঙালীর প্রাণের দোসরকে।

শ্রাবণ যাকে উপহার দিল বাঙালীকে, তিনি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, আর যিনি এই শ্রাবণেই বাঙালীর কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন, তিনি হলেন বাঙালীর জীবন দেবতা — রবীন্দ্রনাথ।

যিনি এলেন শ্রাবণে — সুকান্ত, তাঁর সমগ্র জীবন পেয়েছিলেন কুড়ি বছর নয় মাস। আর যিনি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে চলে গিয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেঁচে থাকার সময় পেয়েছিলেন আশী বছরের বেশী। তাঁর বহুবিধ সৃষ্টি আজ এত বছর পরেও, আমাদের মনে, প্রাণে, হৃদয়ে টিকে আছে।

কিন্তু সেই কিশোর সুকান্ত, যে কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝড়ে পড়ল এই ধরার ধূলিতে, সেও তো একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে আমাদের নিত্য জীবনশৈলীতে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় সুকান্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, "জীবনের অভিজ্ঞতাকে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

সম্পাদকীয়

প্রতিযোগিতার রূঢ়তা নয়, মিলনের আনন্দে প্লাবিত হোক শিশুকিশোর মন। পুরস্কার পাওয়াটা বড় কথা নয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হোক। স্টুডেন্টস হেলথ হোম এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পরিচালনা করে 'উৎসব', 'উৎসব ২০১৬' শেষ হোলো সেই দর্শনকে সামনে রেখে। কয়েক বছর পর কলকাতার বাইরে অনুষ্ঠিত হোলো 'উৎসব'। নর্থ হুগলীর আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হোলো 'উৎসব ২০১৬', শৃঙ্খলাপূর্ণ হার্দিক পরিবেশে পরিচালনা করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেন নর্থ হুগলী আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংগঠকবৃন্দ। আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো এতে উৎসাহিত বোধ করবেন এবং পরবর্তী বছরগুলোতে উৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আদর্শকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত হিসাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা অবশ্যই অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।

এই প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হবে তখন আমরা ২০১৬ কে অতিক্রম করে ২০১৭ পদার্পণ করেছি। স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনকে জোরদার করতে হেলথ হোমকে রক্ষা করতে আরোও একটি বছর আমরা অতিক্রম করলাম। এই উদ্যোগে আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ অভিনন্দন যোগ্য।

মানুষ সুকান্ত

(একের পাতার পর)

ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেতে খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।''

কিন্তু, সুকান্তর ক্ষেত্র ভিন্ন। তাঁর তো আরম্ভে সমাপ্তি হয়নি। যেখানে আমরা ভাবি তাঁর সামাপ্তি ঘটল, বাস্তবে সেটাই হল তাঁর শুরু। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, খুব কম মানুষ আছেন, যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁর অসাধারণ সৃষ্টির স্বীকৃতি দিতেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি পেয়েছেন যন্ত্রণা। আর অসময়ে তাঁর প্রস্থান, আমাদের এনে ফেলে দিয়েছে এক অসীম গহ্বরে, যেখানে এখনও আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি তাঁর আসল মনস্তত্ত্ব।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর এক জায়গায় বলেছেন, ''সুকান্ত বড় কবি হলেও বয়স তাঁর একুশ পেরোয়নি।'' চেহারা বিচার করলে সুকান্ত কোনদিনই খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। নানারকম অসুখে বলতে গেলে তিনি শীর্ণকায় ছিলেন। নানা সমস্যা জর্জরিত পরাধীন ভারতে, স্বল্প জীবনের অনেকটাই তাঁর করতে হয়েছে মৃত্যুর সাথে লড়াই। এই লড়াই এর মধ্যে দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন কট্টর বাস্তববাদী, প্রতিষ্ঠান বিরোধী শক্ত মানসিকতাসম্পন্ন এক কঠিন ব্যক্তিত্ব। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছেন বড় কবি। এই 'বড়' কথাটির ব্যাখ্যা সুকান্ত নিজেই করে গেছেন, তাঁর আপন সাহিত্যে। তাঁর 'এক যে ছিল' কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি লিখছেন,

''তাই বড় হয়ে সে বড় মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসাবে হল অনেক বড়''

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুকান্ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবোধে বড় মানুষ হওয়ার থেকে মানুষ হিসাবে অনেক বড় হওয়াকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। সুকান্ত নিঃসন্দেহে বিশাল বড় মাপের কবি ছিলেন। কিন্তু, তার থেকেও অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। আর তাই, একুশ বছর জীবনকালে, অল্প সময়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার গবেষণা বোধ হয় কোনও দিনই শেষ হবে না।

আজকের যুগে বহু মানুষ আছেন, যাঁরা ঠিক তাঁদের পরের প্রজন্মকে স্বীকার করতে চান না। ছোটরা যা করছে, সেটাই যেন খারাপ। এই সব মানুষের একবার সুকান্তর ''আঠারো বছর বয়স'' কবিতাটি পড়ে নেওয়া উচিত। আঠারো বছর বয়সের মানুষেরা যে কি করতে পারে, তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই কবিতায়। কবিতার শেষে তিন লিখছেন—

''এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায়না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুরে আঠারো আসুক নেমে।''

সুকান্ত চাইতেন, আঠারো বছর বয়সের মানুষে দেশ ভরে যাক স্থায়ী ভাবে। আজকের সমাজে যারা মনে করেন ষাট বছর বয়স না হলে, মাথার চুল সাদা না হলে, মোটা কাঁচের চশমা না পরলে সমাজ চালানো যায়না।প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা যায় না, তাঁরা শিক্ষা নিন সুকান্তর থেকে। কারণ, পৃথিবী ধরে রাখে ভবিষ্যত; পৃথিবী ধরে রাখে আগামী প্রজন্ম। একই সুর শোনা গেছে রবীন্দ্রনাথের কথায়—

''ওই যে প্রবীণ ওই যে পরম পাকা—
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপঠে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত আয়রে আমার কাঁচা।''

প্রবীণদের দিয়ে সমাজ চলবে না, পাকাদের দিয়ে সমাজ চলবে না। সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার সবুজদের, দরকার কাঁচাদের।

চেহারায় শীর্ণকায় হলেও, মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন কঠোর। ছিলেন বলিষ্ঠ, ছিলেন বিক্ষুব্ধ। তাই তো, পরাধীন ভারতে একমাত্র সুকান্তর লেখনী দিয়েই বেরুতে পারে —

''অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন
অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরো —
দেখি এই দেশে অন্ন নেই কো কারো।''

কবির মনে ছিল ক্রোধ, কবির মনে ছিল ক্ষোভ তিনি জন্মেই দেখেছেন ''ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।'' সুকান্ত বেঁচেছিলেন পরাধীন ভারতে। বোধ হয় স্বাধীনচেতা ভারতকে তিনি দেখতে চাননি। তাই, স্বাধীনতার কয়েকমাস আগে, হয়তো স্বেচ্ছায় তিনি আড়ালে চলে গেলেন। হয়তো আজও তিনি আড়াল থেকে দেখে যাচ্ছেন, ''বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারদিকে।''

অথচ, এই বিক্ষুব্ধ মানসিকতাতেই তিনি প্রশস্তি করেছেন ভারতবর্ষের আর এক ক্ষণজন্মা পুরুষকে, যিনি সমগ্র বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে করে দিয়েছিলেন এক বিশেষ স্থান। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুকান্ত বলেছেন, ''মৃত্যু কাউকেও গ্রাহ্য করেনা। ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলকেই সে নিঃসংকোচে গ্রাস করে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন জীবনের মোহনায় এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বয়স উনচল্লিশ বছর। এই অল্প বয়সে যেদিন ভারতে প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য অস্ত গেল সেদিন সকলেরই চোখে জল এসেছিল।''

এক কিশোর আর এক যুবককে বলছে, 'ভারতে প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্য।'' এর থেকে বড় পূজার উপকরণ আর কি হতে পারে? তের বছর বয়সের একজন শিশুর কাছে, এর থেকে বেশি শ্রদ্ধার উপাচার আর কি থাকতে পারে? অন্য দিকে গান্ধীজীর প্রতি কবি লিখলেন,

''তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে, তোমাকে গড়ব প্রচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।'' কবি বিশ্বাস করতেন যে এই পরাধীন দেশের ধ্বংস-বিকীর্ণ অবস্থায়, এক মাত্র পথ দেখাতে পারেন গুজরাটের সেই মানব-দরদী ভারতপ্রেমী মানুষটি।

আধুনিক বাংলায় তথা ভারতবর্ষে সুকান্তকে নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে সুকান্তের জীবনের দুটো দিক। এক — কবি সুকান্ত, এবং অন্যটি মানুষ সুকান্ত। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যে বার্তা রেখে গেছেন, তা তাঁর দুরদর্শীতারই পরিচয় দেয়। বর্তমান ভারতে বেশী প্রয়োজন মানুষ হিসাবে যারা বড়, তাদের। বড় মানুষেরা নাম কিনতে পারেন, কিন্তু দেশ গড়তে পারেন না। মানুষ হিসাবে যারা বড়, তাদের চরিত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবে আগামী দিনের পথ প্রদর্শক, যারা মনে-প্রাণে হবে সবুজ, আর কাঁচা।

সার্ধ শতবর্ষে

(চারের পাতার পর)

ভগিনী নিবেদিতা

রাধাগোবিন্দ দেশের মানুষদের চেনেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের অভাব এদের মজ্জায়। রাধাগোবিন্দ সারাদিন প্লেগ রোগীর পরিচর্যায় মগ্ন।

ড. আর জি কর বাগদি বস্তিতে দেখলেন এক ইউরোপীয় মহিলাকে। স্যাঁতস্যাঁতে মলিন ঘর। নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। দিনের পর দিন সেখানেই আছেন।

রাধাগোবিন্দ জানিয়ে দিয়েছেন শিশুটির বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। নিবেদিতার লড়াই চলছে।

ঘর পরিশোধন করছেন। ছোট একটা মই নিয়ে ঘর চুমকাম করছেন।

ছেলেটি বাঁচল না। নিবেদিতা নেমে পড়লেন বস্তি পরিষ্কারের কাজে। বস্তিতে বস্তিতে ঘোরেন, পরিদর্শন করেন, কাজে হাত লাগান। খেয়াল করে দেখেছেন রাস্তা-নালি পরিষ্কারের কাজ করে যারা, যাদেরকে এদেশের লোক ধাঙড় বলে, অপূর্ব তাদের দেহ সৌষ্ঠব, কর্মদক্ষতা।

বিসর্জনের দিন

১৯১১। অক্টোবর মাস। দার্জিলিং শহর কয়েক দিন ধরে মেঘ কুয়াশায় মুখ ঢেকেছে। পুজোর ছুটি কাটাতে এসেছেন নিবেদিতা। সঙ্গে জগদীশ আর অবলা।

নিবেদিতা শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। অবলা খেয়াল রাখছেন নিবেদিতার। শরীরের আর কী দোষ। ধকল তো কম যায় না।

পূর্ববঙ্গে ত্রাণকার্যে গিয়ে সেই যে শরীর ভাঙল, আর যেন সারেই না।

কাছের মানুষরা চলে যাওয়ার পর কেমন উদাসীনও হয়ে গেছেন। নিবেদিতার মা গেলেন, ওলি বুল গেলেন। তাঁদের যাওয়ার সময় নিবেদিতা গিয়েছিলেন ও-দেশে।

বিবেকানন্দ মায়েপ খোঁজ নিতেন নিয়মিত, ভূপেনকে কথা দিয়েছিল। তাঁরাও দেহ গেল।

নিবেদিতা একটা উইল করেছেন। তাঁর জমা টাকা আর বইয়ের রয়্যালটি বিবেকানন্দের মঠের ট্রাস্টিদের দিয়ে দিয়েছেন। মন যেন সব কিছু থেকে তুলে নিয়েছেন।

১৩ অক্টোবর আজ মেঘ নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে. হিমালয় শিব-দুর্গার হিমালয়।

কমলালেবু রঙের বস্ত্র পরেছেন নিবেদিতা আজ। একটু যদি ভালো থাকেন। নীলরতন সরকার এখন দার্গিজলিং-এ। নিয়মিত দেখে যাচ্ছেন। সকালবেলার আলো এসে পড়ছে আজ কয়েকদিন পর। অবলা শুনতে পান নিবেদিতা বলছেন নৌকা ডুবে যাওয়ার কথা।

নৌকা ডুবছে।

কিন্তু সূর্যোদয় দেখতে পাবেন তিনি। নিবেদিতার চুয়াল্লিশ বছরের দেহটা ভাঁজ করা কাপড়ের মতো পড়ে রইল।

হিলকার্ট রোড দিয়ে যাচ্ছে নীরব শোকগ্রস্ত মানুষের দল।

আজ তাঁদের বিসর্জনের দিন।

মারি কুরি

ঘর ধোঁয়াধুলোয় অন্ধকার। অবশেষে মিলল সেই মৌল। মারি-র মাতৃভূমির স্মরণে কুরি দম্পতি তার নাম দিলেন পোলোনিয়াম। কয়েক মাস পরে ও-রকম আরও এক মৌল। রেডিয়াম। ১৯০৩। রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আবিষ্কার, তার ব্যাখ্যা এবং প্রবল গবেষণার জন্য ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ তিন জনকে। বেকারেল, পিয়ের এবং মারি। ১৯০৫-এর শেষ দিক থেকে পিয়ের অসুস্থ। হাড়ে হাড়ে ব্যথা। বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। হাতে ঘা। মারিও অসুস্থ। তাঁরও অসুখ প্রায় একই রকম। আসলে দুজনেই রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার বিষে আক্রান্ত। ওঁরা না জেনে সমানে ঘাটাঘাঁটি করেছেন ইউরোনিয়াম, পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম। পিয়ের, যিনি বলতেন রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি, তিনি বন্ধুদের দেখাতে রেডিয়াম বুক পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। আর মারি? ঘুমনোর সময় বিছানার পাশে কিছুটা রেডিয়াম-সমন্বিত যৌগ রাখতেন। যাতে তা অন্ধকার ঘরে আলো ছড়ায়। ১৮৯৭-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কুরি দম্পতির তিনটে ল্যাবরেটরি নোটবুক এখনও যত্নে রাখা প্যারিসের 'বিবলিয়োথেক ন্যাশনাল'-এ। ওগুলো থেকে এখনও ছড়াচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা। এতটাই যে, আজ যদি কোনও গবেষক ওগুলো ঘাঁটতে চান, তা হলে তাঁকে মুচলেকা দিয়ে ঘোষণা করতে হয় তিনি বিপদে বুঝে কাজে নামছেন। তাই এখন গবেষকদের ধারণা শুধু তেজস্ক্রিয়তার বিষে মারা যেতে পারতেন পিয়ের এবং মারি।

অবশ্য পরোক্ষে তাতেই মারা গেলেন পিয়ের। হাঁটছিলেন খুঁড়িয়ে।১৯০৬-এর ১৯ এপ্রিল রাস্তা পেরোতে গাড়ি চাপা। তক্ষুনি মৃত্যু। খবর পেয়ে মারি শোকে পাগলিনি। ডায়রিতে লিখলেন, 'আমি ঘরে ঢুকলাম। এক জন বলল, ও মারা গেছে। কথাটার মানে কী? পিয়ের নেই। সেই যাকে সকালে বেরোতে দেখলাম। সে, যে সন্ধেয় ফিরে আমার হাতটা ধরত। তার মৃতদেহ দেখব? সব শেষ হয়ে গেল? তোমার নাম ধরে বার বার ডাকছি। পিয়ের, পিয়ের, আমার পিয়ের। হায়, ডাকে তুমি সাড়া দেবে না। একাকীত্ব আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া যে আর কিছু রইল না আমার।'

১৯১১। নোবেল কমিটির বৈঠক। মনোনীত হবে রসায়নে পুরস্কার প্রাপক। উঠে এল মারির নাম। কারও কারও আপত্তি। মাত্র আট বছরের মধ্যে দু'বার নোবেল? আপত্তি টিকল না। যুক্তি জোরদার। আগের বার পেয়েছিলেন রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণার জন্য, এ বার দুই নতুন মৌল— পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য মারি পাবেন প্রাইজ।

১৯৩৪-এর ৪ জুলাই মৃত্যুর আগে মারি দেশে-বিদেশে সেলেব্রিটি। মৃত্যু? লিউকিমিয়ায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘাটাঘাঁটির পরিণাম। এত বছর যে বেঁচে ছিলেন সেটাই বিস্ময়ের। চলে গেলেন ৬৬ বছর বয়সে। আর একটা বছর বাঁচলে দেখতে পেতেন মেয়ে আইরিন এবং জামাই ফ্রেডেরিখ পাচ্ছেন নোবেল প্রাইজ। সেই রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি গবেষণারই সূত্রে!

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়। তবুও যোগীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। হাসি আর খুশিই ছিল তার রচনার মূল বিষয়। স্কুলপাঠ্য বইয়ের চেনা জগৎ থেকে, এই স্বাতন্ত্র্য তাকে ছোটদের অন্য উপহার তুলে দিতে সাহায্য করেছিল। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দুর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সত্যিই যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের মধ্য থেকে পাঠ্যবইয়ের ভীতি দুর করতে পেরেছিলেন।

প্রকাশক হিসাবেও যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা-সাহিত্যে এক অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে তার বিপুল সংখ্যক বই-পুস্তকা প্রকাশিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির বই প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অমৃতলাল গুপ্ত ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমসাময়িক অনেক লেখকের বই-ই ওই প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে জানা যায়, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল তার 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, মানে প্রায় সমসাময়িক। তবুও প্রথমদিকে তাদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যোগীন্দ্রনাথ তৎকালীন বিহারের গিরিডিতে বাড়ি তৈরি করলে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বেড়াতে যান। রবীন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথকে সবসময় উৎসাহ দিতেন। বিভিন্ন সময় তাঁর রচনার ভূমিকা ইত্যাদি লিখে দিতেন। তার শিশুদের উপযোগী রচনাকে বলতেন 'সৎকীর্তি'।

১৮৯৯ সালে তার 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যোগীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম' নামক একটি সঙ্গীত ও সংকলন প্রকাশ করেন। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন ভারত বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী তথা নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর। অর্থাৎ সমসাময়িক প্রায় সব সাহিত্যিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে তিনি তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। জীবনের শেষ দিকে, মৃত্যুর বছরখানেক আগে 'গল্প সঞ্চয়' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। শারদোৎসবের আগে এযনকার শারদ সংকলনের মতো। সেই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্লক করে সেই ভূমিকা রবীন্দ্র হস্তাক্ষর আকারেই ছেপেছিলেন তিনি। সেই ছোট ভূমিকাটি ছিল : ছেলেদের যেমন দুধভাত চাই, তেমনি চাই গল্প। যে মা-মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প যুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে — আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে — কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজও বলছে, গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যারা কোমর বেঁধেছেন, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করতেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।''

আঞ্চলিক কেন্দ্রের খবরাখবর

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও আমাদের স্টুডেন্টস হেলথ হোম চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্বাধীনতা দিবস মহা সমারোহে পালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পাতাকা উত্তোলন করেন আমাদের বর্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতি সুমনা ঘোষ মহাশয়া।

এছাড়াও ২রা সেপ্টেম্বর হোমের প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ হোমের সুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য শিবির

স্টুডেন্টস হেলথ হোম উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৩/০৯/১৬ তারিখ এবং ২৬/০৯/১৬ তারিখ শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে দুটি থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় শিবিরে যথাক্রমে ৯৮ জন ও ১১৫ জন (মোট ২১৩ জন) ছাত্রের থ্যালাসেমিয়ায় বাহক নির্ণয় পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিষয় ঃ রক্তদান শিবির

স্টুডেন্ট হেলথ হোম ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৭/১১/১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার সেবাভারতী মহাবিদ্যালয় (কাপগাড়ি)-এ স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম ও উক্ত কলেজের N.S.S Unit-এর যৌথ উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে মোট ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। মোট ৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী, ২ জন অধ্যাপক এবং ১ জন শিক্ষার্থী রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। হেলথ হোমের অন্যান্য সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সম্পাদক ভারতী চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে বর্ধমান নিবেদিতা কন্যা বিদ্যালয়ে গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৬ স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল, সহযোগিতায় ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন। প্রায় ৪০০ ছাত্রী এই স্বাস্থ্য শিবিরে যোগদান করে।

স্টুডেন্ট হেলথ হোম কোলকাতা আঞ্চলিক কমিটি

১। কোলকাতা আঞ্চলিক কমিটি উদ্যোগে সেন্ট পলস কলেজে বয়সন্ধির কালের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ডাঃ মালতী ঘোষ এই বয়সে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্যা দেখা যায় তা বিস্তারিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করেন। সভা থেকে উদ্ধৃত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দনে। এই অনুষ্ঠানে সেন্ট পলস স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাফায়েল মন্ডলকে সম্বর্ধিত করা হয়। হেলথ হোম সম্পর্কে সর্বজ্ঞ আলোচনা করেন সম্পাদিকা শ্রমতী সুনাতা শ্রীবাস্তব।

২। **থ্যালাসেমিয়া নির্ণায়ক শিবির** কোলকাতা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ সেন্ট পলস স্কুলে এবং গত ৪/১১/২০১৬ গরফা ডি এন মেমোরিয়াল হাই স্কুলে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির হয়। সেন্ট পলস স্কুলে ৫৭টি স্যাম্পেল এবং গড়ফা ডি এ এম স্কুলে ৪৮টি স্যাম্পেল সংগৃহীত হয়। উপস্থিত ডাক্তার বাবুরা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিস্তৃত আলোচনা করেন ও নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

৩। গত ২৯শে নভেম্বর ২০১৬ স্টুডেন্ট হেলথ হোম মূল কেন্দ্রের উদ্যোগে সেমিনার হলে মৃগী রোজ নিয়ে আলোচনা সভা হয়। ডাঃ তৃষিত রায় এই ধরনের আলোচনার উপযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। ডাঃ অরিজিত রায় মৃগীরোগ সম্পর্কে প্রোজেক্টার সহকারে মৃগী রোগের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় ১৫০ জন অভিভাবক ও অভিভাবিকা উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলন

চন্দননগর খলিসানী নারী শিক্ষা মন্দির স্টুডেন্টস হেলথ হোম চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মূলত বিদ্যাসাগর-এর স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী মুক্তির ভাবনাকে কেন্দ্র করে আজকের সমাজে মেয়েদের দায়িত্ব কর্তব্য ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রুমা সরকার হেলথ হোমের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক সুমনা ঘোষ এবং হেলথ হোমের বিশিষ্ট কর্মী বাদল চ্যাটার্জী ছাত্রীদের হেলথ হোমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। হেলথ হোম আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী দুর্গাদাস বিশ্বাস হেলথ হোম গঠনের ইতিহাস, স্বাস্থ্য সচেতনার প্রয়াস এবং বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার, প্রসার, সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বক্তব্য রাখন। বক্তব্য রাখেন আজকের অবক্ষীয় সমাজে নারী মর্যাদা কীভাবে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে।

শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্রর জন্মদিন

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৭তম জন্মদিন। এই দিন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে ইন্দুমতী গার্লস হাইস্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করল। প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রী ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষায়িত্রী মিনতি কর স্বাগত ভাষণ দেন এবং হেলথ হোমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমেই ছাত্রীদের পক্ষে রুকসানা খাতুন বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি লিখিত রচনা পাঠ করে। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীময়ি ভৌমিক অত্যন্ত সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। হেলথ হোমের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক সম্পাদক শ্রমতী সুমনা ঘোষ, দুর্গাদাস বিশ্বাস এবং মুন্না পন্ডিত। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসী বিভাগ) -এর প্রাক্তন প্রধান এবং চন্দননগর হেলথ হোমের বিশিষ্ট কর্মী দুর্গাদাস বিশ্বাস ছাত্রজীবনে ও সমাজজীবনে হেলথ হোমের ভূমিকা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ মানসিকতা ও সমাজ ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ছাত্রীদের আগ্রহ বিদ্যালয়ের আতিথেয়তা, আন্তরিকতা এবং উদ্যোগকে সম্পাদক শ্রীমতী সুমনা ঘোষ ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাজ্যস্তরের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (উৎসব ২০১৬)-র ফলাফল

বিভাগ-ক

নৃত্য

স্থান	নাম	আঞ্চলিক কেন্দ্র	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
প্রথম-	কোজাগরী ঘোষ	নর্থ হুগলি	চুঁচুড়া বালিকা বানীমন্দির
দ্বিতীয়-	আন্বেষা কুন্ডু	মেদিনীপুর	মিশন গার্লস প্রাথমিক
তৃতীয়-	আকাঙ্খা ধর	সি.পি.সি	ওয়েল এ্যান্ড গোল্ড স্মিথ

আবৃত্তি

প্রথম-	অগ্নিভ রায়	সি. পি. সি	নব নালন্দা স্কুল
দ্বিতীয়-	সোমদত্তা দে	মেদিনীপুর	সরস্বতী শিশুমন্দির
তৃতীয়-	মনামী দেবনাথ	নর্থ কলকাতা	শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়

বিভাগ-খ

নৃত্য

প্রথম-	স্নেহা দাস	হাবড়া	হাবড়া কামিনীকুমার গার্লস হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	রজনী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর	বিশপ মরো স্কুল
তৃতীয়-	সানা দত্ত	নর্থ কলকাতা	বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস হাইস্কুল

আবৃত্তি

প্রথম-	শুচিব্রতা বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর	লেডি কারমাইকেল গার্লস হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	শ্রীজয়ী চিনা	বালি	বেলুড় গার্লস হাইস্কুল
তৃতীয়-	অঙ্কনা বড়াল	বহরমপুর	বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়

বসে আঁকো

প্রথম-	অরিত্র কুমার দাস	কলকাতা	ঙ ঙ আ কাশিপাড়া ইংলিশ স্কুল
দ্বিতীয়-	অঙ্কিতা ধর	কাটোয়া	
তৃতীয়-	সৌরভ কুমার পাত্র	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল

বিভাগ-গ

আবৃত্তি

প্রথম-	ইপ্সিতা নায়েক	কৃষ্ণনগর	হোলি ফ্যামিলি গার্লস
দ্বিতীয়-	বিদীপ্তা চ্যাটার্জী	কালিয়াগঞ্জ	মিলনময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
তৃতীয়-	স্বস্তিকা চন্দ	হাবড়া	অশোকনগর বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুল

রবীন্দ্রসঙ্গীত

প্রথম-	পূর্ণা মুখার্জী	নর্থ কলকাতা	সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় ও শিক্ষা সদন
দ্বিতীয়-	সুচেতা চঁদ	গুসকরা	গুসকরা বালিকা বিদ্যালয়
তৃতীয়-	প্রগতিরঞ্জন সরকার	হাবড়া	হাবড়া হাইস্কুল

বসে আঁকো

প্রথম-	সৌরভ সরকার	কালিয়াগঞ্জ	দরিমাপুর বি.এস. হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	অরুণিমা মন্ডল	বেলঘরিয়া	মহাকালী গার্লস হাইস্কুল
তৃতীয়-	ঐন্দ্রিলা সাহা	বহরমপুর	বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুল

বিভাগ-ঘ

আবৃত্তি

প্রথম-	অভিনব চ্যাটার্জী	নর্থ হুগলি	হুগলি ব্রাঞ্চ (গভঃ) স্কুল
দ্বিতীয়-	পৌষালি ব্যানার্জী	বেলঘরিয়া	মহাকালী গার্লস হাইস্কুল
তৃতীয়-	সুচরিতা দাস	রামপুরহাট	রামপুরহাট গার্লস হাইস্কুল

নজরুলগীতি

প্রথম-	শ্রেয়া সিংহ	হাবড়া	হাবড়া কামিনীকুমার গার্লস হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	শ্রেয়সী রুইদাস	রানীগঞ্জ	জি.এম.জি. গান্ধী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল
তৃতীয়-	স্মিতেশ বেরা	মেদিনীপুর	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন

বিভাগ-ঙ

আবৃত্তি

প্রথম-	সৌমিলী মন্ডল	মেদিনীপুর	মিশন বালিকা বিদ্যালয়
দ্বিতীয়-	অঙ্কিতা ঘোষ ফর	নর্থ কলকাতা	উল্টোডাঙ্গা গভঃ স্পনসর স্কুল গার্লস
তৃতীয়-	মণীষা মুখার্জী	জিয়াগঞ্জ	আজিমগঞ্জ কেশর কুমারী

প্রবন্ধ

প্রথম-	সাত্যকি সিংহ	কান্দি	জেমো নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়
দ্বিতীয়-	মৌমিতা মাহাতো	ঝাড়গ্রাম	রানী বিনোদমঞ্জরী গভঃ গার্লস স্কুল
তৃতীয়-	স্বর্ণেন্দু ভড়	বেলঘরিয়া	আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল

বিভাগ-চ

আবৃত্তি

প্রথম-	সায়ন্তনী ব্যানার্জী	রানীগঞ্জ	ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ
দ্বিতীয়-	মৌলী গাঙ্গুলী	নর্থ হুগলি	হুগলি উইমেন্স কলেজ
তৃতীয়-	অনন্যা প্রতিহার	মেদিনীপুর	বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিতর্ক

প্রথম-	শুভম রায়গুপ্ত	নর্থ কলকাতা	এস.এ. জয়পুরিয়া কলেজ
দ্বিতীয়-	শমিষ্ঠা কাঞ্জিলাল	কলকাতা	সংস্কৃত কলেজ
তৃতীয়-	দেবলীনা ঘোষ	নর্থ কলকাতা	বাগবাজার উইমেন্স কলেজ

প্রশ্নোত্তর

প্রথম-	শ্রেয়া দাস		
	শুভেচ্ছা পাত্র	মেদিনীপুর	আলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ
	সুপর্ণা সাউ		বালিকা বিদ্যালয়
দ্বিতীয়-	মধুরিমা চ্যাটার্জী		
	পারমিতা ঘোষ	বালি	বালি গার্লস হাইস্কুল
	পৃথা ঘোষ		
তৃতীয়-	প্রজ্ঞা দাস		
	নম্রতা দাম মজুমদার	নর্থ হুগলি	হুগলি গার্লস হাইস্কুল
	সায়নী ঘোষ		

হিন্দি

বিভাগ-ক

আবৃত্তি

প্রথম-	মধুকুমারী যাদব	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ
দ্বিতীয়-	বৈষ্ণবী জয়সওয়াল	কলকাতা	আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়
তৃতীয়-	অর্চিতা চৌহান	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ

বিভাগ-খ

কবিতাপাঠ

প্রথম-	প্রিয়া সাউ	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ
দ্বিতীয়-	প্রিয়া রজক	কলকাতা	আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়
তৃতীয়-	চাঁদনী গুপ্তা	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ

বিভাগ-গ

গদ্যপাঠ

প্রথম-	পিয়াসা মহান্তি	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ
দ্বিতীয়-	রাহুল কুমার দাস	নর্থ হুগলি	সাহাগঞ্জ ডানলপ হিন্দি হাইস্কুল
তৃতীয়-	অঙ্কিত সিং	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ

কবিতাপাঠ

প্রথম-	অঙ্কিত সিং	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ
দ্বিতীয়-	পিয়াসা মহান্তি	বেলঘরিয়া	শ্রী সরস্বতী বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ

যোগাসন

বিভাগ-ক

ছাত্র

প্রথম-	প্রীতম পাল	বেলঘরিয়া	উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়
দ্বিতীয়-	শুভ দেবনাথ	হাবড়া	প্রফুল্লনগর বিদ্যামন্দির
তৃতীয়-	রিপন আচার্য	ঝাড়গ্রাম	রাজা বীরেন্দ্রবিজয় ইনস্টিটিউশন

ছাত্রী

প্রথম-	পারমিতা মন্ডল	নর্থ হুগলি	সাহাগঞ্জ ফুলকুমারী গার্লস হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	সায়ন্তনী সাহা ফর	কলকাতা	টাকী হাউস গভঃ স্পনসর স্কুল গার্লস
তৃতীয়-	দেবপর্ণা গোস্বামী	কান্দি	কান্দি রাজ হাইস্কুল

বিভাগ-খ

ছাত্র

প্রথম-	প্রজ্জ্বল চন্দ্র	জিয়াগঞ্জ	রাজা বিজয় সিং উচ্চ বিদ্যালয়
দ্বিতীয়-	রাজীব কুন্ডু	বহরমপুর	সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ
তৃতীয়-	সৌরদীপ নায়েক	রানীগঞ্জ	রানীগঞ্জ হাইস্কুল

ছাত্রী

প্রথম-	কৃষ্ণা দেবনাথ	নর্থ হুগলি	সাহাগঞ্জ ফুলকুমারী গার্লস হাইস্কুল
দ্বিতীয়-	আরিত্রিকা হাজরা	বেলঘরিয়া	আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়
তৃতীয়-	সোহিনী লাহিড়ী	ঝাড়গ্রাম	শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ গার্লস হাইস্কুল

সার্ধ শতবর্ষে

ভগিনী নিবেদিতা

(সংগৃহীত)

সালতামামি

১৮৬৭ জন্ম
২৮ অক্টোবর-এ
১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেসউইকে শিক্ষকতার সূত্রপাত
১৮৮৬ রাগবির অনাথ আশ্রমে মেয়েদের শিক্ষাদান
১৮৮৭ রেক্সহামে শিক্ষকতা
১৮৮৯ চেস্টারে শিক্ষিকার পদে যোগ দিলেন
১৮৯১ ডি লিউ-এর স্কুলে যোগদান
১৮৯৪ নিজের দ্য কিংসলে স্কুলের প্রতিষ্ঠা
১৮৯৫ বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা
১৮৯৮ ভারতবর্ষে এলেন
১৮৯৯ কলকাতায় প্লেগ, নিবেদিতার সেবা বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে ইংল্যান্ড যাত্রা
১৯০২ নিবেদিতা ভারতে ফিরলেন, ওকাকুরার সঙ্গে দেখা, স্বামীজির দেহত্যাগ
১৯০৫ কার্জনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান
১৯০৬ পূর্ববঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা
১৯০৭ আবার পাশ্চাত্যে
১৯০৯ নিবেদিতার মায়ের প্রয়াণ
১৯১০ কলকাতায় ফিরলেন। দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম প্রকাশিত হল। কর্মযোগিন পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন, নভেম্বর মাসে মিসেস বুলের শরীর খারাপের খবর পেয়ে বস্টনে গেলেন।
১৯১১ ওলি বুলের প্রয়াণ। এপ্রিল মাসে কলকাতায় ফিরলেন নিবেদিতা। ১৩ অক্টোবর শুক্রবার সকালে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে নিবেদিতার দেহত্যাগ।

বোসপাড়া লেনের নিবেদিতা

নিবেদিতার কাজ মানুষকে নিয়েই। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর কাজ শুরু হয়ে গেল।

যে দেশে তাঁর কাজ, সেই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যাওয়া চাই।

এ দেশে নেমেই প্রথমে পার্ক স্ট্রিটে ছিলেন কিছু দিন, এবার আর সাহেবপাড়া নয়, কিন্তু উত্তর কলকাতার ব্ল্যাক টাউনে মেমসাহেবকে থাকতে দেবে কে?

১০/২ বোসপাড়া লেনে সারদা মা থাকেন। লাল মেঝের ঘর। আসবাবের বালাই নেই। মাদুর পাতা। মাদুরের ওপর একটা বালিশ আর মশারি। সেখানে নিবেদিতার থাকার ব্যবস্থা হল।

নিবেদিতা তো মায়ের কাছে ম্লেচ্ছ নন। নরেনের সঙ্গে মেয়েটা এ দেশে কাজ করতে এসেছে, সে আবার ম্লেচ্ছ হবে কেন!

পল্লিগ্রামে আত্মীয়স্বজনরা কিন্তু ছি ছি করছে। সারদা মাকে না তারা এবার একঘরে করে দেয়।

মা সারদা অবশ্য নির্বিকার। বুঝতে পেরে নিবেদিতাই চলে যেতে চান। উল্টো দিকে ১৬ নং বোসপাড়া লেন।

ঘর পাওয়া গেল। তবে কাজের লোক পাওয়া গেল না। নিবেদিতা ফল, দুধ খেয়ে চালিয়ে দিলেন। শেষে একটি মেয়ে কাজ করতে রাজি হল, তবে সে যখন খাবে বা রান্না করবে তখন নিবেদিতার ত্রিসীমানায় যাওয়া চলবে না।

এখানে একটা স্কুল খুলতে চান নিবেদিতা। মেয়েদের জন্য অন্য রকম স্কুল।

ছাত্রী জোগানোর জন্য সভা ডাকা হল। মাস্টারমশাই, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু ও আরও অনেকে এসেছেন।

নিবেদিতা ইংরেজিতে আবেদন জানাবেন, বাংলায় এখনই এত কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বামীজি এসে সবার পেছনে বসলেন। নিবেদিতা খেয়াল করেননি। স্বামীজি কাউকে কাউকে গুঁতোচ্ছেন।—"মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। পড়াশোনার বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে। উত্তর দে। বল রাজি।"

শেষে হরমোহনের হয়ে নিজেই বলে দিলেন, "ওয়েল, মিস নোবল, দিস জেন্টলম্যান অফার্স হিজ গার্ল টু ইউ।'

স্বামীজিকে দেখতে পেয়ে আর ছাত্রী পাওয়ার কথা শুনে নিবেদিতা আনন্দে বিভোর হয়ে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন।

নিবেদিতা চান ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কাজ করবে, সাহসী হবে, আবার মেয়েদের সহজাত যে সৌন্দর্যবোধ, তা'ও হারিয়ে ফেলবে না।

কালীমূর্তি নিবেদিতার বড় প্রিয়। সেই মূর্তি সাহসিনীর মূর্তি, দেখতে জানলে তার মধ্যে অন্য রকম সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বামীজি উত্তর ভারতে ভ্রমণকালে কালীর রূপ ও ভাব নিয়ে ইংরেজিতে অপরূপ একটি কবিতা লিখেছেন।

নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে একটা উঠোন আছে। এই উঠোনটি নিবেদিতার বড় ভালো লাগে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে রাতের তারা ভরা আকাশ দেখেন তিনি। দেখতে দেখতে নিবেদিতা ভাবেন ভারতীয় সমাজ বাইপে থেকে দেখলে হবে না, বাড়ির ভেতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

নিবেদিতা এখন বোসপাড়া লেনের রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় ভাঙা বাংলায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, তারাও মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

বাগদি বস্তির ছেলেকে কোলে নিয়ে

ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছেন রাধাগোবিন্দ কর। শ্যামবাজারের বাড়িতে চিকিৎসা শুরু করেছেন।

কলকাতায় প্লেগ এলো। লোকজন কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি দ্বিগুণ তিনগুণ ভাড়া হাঁকছে। শিয়ালদহ স্টেশনে পাঁচখানা অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়া হয়েছে, তবু পালিয়ে যাওয়া মানুষের ভিড় শেষ হচ্ছে না। *(এরপর দুয়ের পাতায়)*

মারি কুরি

(সংগৃহীত)

মাত্র ৮ বছরের ব্যবধান দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন যিনি তিনি এক মহিলা। বিজ্ঞানী। বিখ্যাত। কারণ, মাত্র আট বছর আগে, ১৯০৩ সালে, তিনি পেয়েছিলেন সে প্রাইজ। সে বার ফিজিক্সে। এ বার মনোনীত হয়েছেন কেমিস্ট্রি প্রাইজের জন্য। অর্থাৎ, মাত্র আট বছরের ব্যবধানে দু'দু'বার দুই আলাদা বিষয়ে নোবেল।

কে তিনি? মারি স্কোদাওস্কা কুরি। মাদাম কুরি। বিজ্ঞানজগৎ তাঁকে জানায় কুর্নিশ। সে তো তাঁর গবেষণার জন্য। তার বাইরেও তিনি এক প্রতীক। দুঃসহ বাধা ডিঙিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর।

আশ্চর্য জীবন বটে! জন্ম পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে। ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর। বাবা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। মা মেয়েদের স্কুলে হেড মিস্ট্রেস। চাকরি খুইয়ে বাবা অচিরে বেকার। তিন বোন আর এক ভাইয়ের সংসারে অনটন। অগত্যা বাবা বাড়িকে বানিয়ে ফেললেন কিছুটা বোর্ডিং। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রদের বাড়িতে রেখে কিছুটা রোজগার। সংসারে দারিদ্র্য, কিন্তু বাবা-মায়ের শিক্ষায় ছেলেমেয়ে সবাই ব্রিলিয়ান্ট। মারি তো ক্লাসে ফার্স্ট। কয়েক বছর বাদে, এক বোন মারা গেল টাইফয়েডে। মা যক্ষ্মা রোগে। সংসারের হাল ধরতে হল মারিকে। কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে যেতেই হবে। ওয়ারশ'তে সে সুযোগ নেই। আছে প্যারিসে। খরচ? প্ল্যান আঁটলেন মারি। ডাক্তারি পড়তে বোন যাবে প্যারিস। খরচ জোগাতে রোজগারে নামবেন মারি। ডাক্তার হয়ে নিজে রোজগার শুরু করলে পড়াশুনা করতে দিদিকে প্যারিস নিয়ে যাবে বোন।

অষ্টাদশী মারি ওয়ারশ' থেকে দূরে ধনী জোরাওস্কি পরিবারে গভর্নেস। দিনে ও-বাড়ির মেয়েদের পড়ানো, রাতে নিজের বইপত্র নিয়ে বসা। মন কেড়ে নিচ্ছে দুই বিষয়। গণিত। পদার্থবিদ্যা। ক্রমে মন কাড়ল এক যুবকও। জোরাওস্কি পরিবারের বড় ছেলে। বাদ সাধলেন পরিবারের কর্তা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবাকে রাজি করাতে সময় চাইলেন ছেলেটি। পাঁচ বছর অপেক্ষা করলেন মারি। ধনী বাবার বাধ্য ছেলে ভঙ্গে দিলেন রণে। মারি চিনলেন সমাজ।

ততদিনে বোন প্যারিসে ডাক্তার। বিয়ে করেছেন এক ডাক্তারকে। সচ্ছল পরিবার। পড়াশুনা করতে মারির এবার প্যারিস যাওয়ার পালা। গেলেন। ভর্তিও হলেন স্বপ্নের সোরবোন-এ কিন্তু বেশি দিন থাকলেন না বোনের পরিবারে। জামাইটা বড় আমুদে। হইহল্লোড় লেগেই থাকে। পড়াশুনোয় ডিসটার্ব হয়। বোনের বিলাসবহুল পরিবার ছেড়ে মারি গিয়ে উঠলেন কলেজের কাছে এক বাড়ির একখানা খুপড়ি ঘরে। সে-ঘর গ্রীষ্মে বয়লার, শীতে ফ্রিজ। রোজগার বলতে ল্যাবরেটরিতে কাচের পাত্র ধোয়ামোছার কাজ। পড়াশুনোয় মনপ্রাণ। রান্নার সময় নেই। পেট ভরাতে পাউরুটি আর শুকনো ফল। বা পাউরুটি আর এক টুকরো চকলেট। কষ্টের সেই দিনগুলো সম্পর্কে পরে স্মৃতিকথায় মারি-র মন্তব্য : 'এ জীবন, কোনও কোনও দৃষ্টিকোণে বেদনাদায়ক হলেও আমার কাছে প্রকৃত আনন্দের। আমি পেলাম মুক্তি আর স্বাধীনতার স্বাদ, যা দারুণ মূল্যবান। প্যারিসে আমি অজানা-অচেনা, হারিয়ে গেলাম বিশাল শহরে। কিন্তু সেখানে একা থাকার, অন্যের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকার, অনুভূতি মোটেই হতোদ্যম করল না আমাকে, বরং এক প্রশান্তি আর তৃপ্তি ছেয়ে রাখল মন।' ফল মিলল একাগ্র পড়াশুনোর। মারি ফিজিক্সের ডিগ্রিতে প্রথম। প্রথম ম্যাথমেটিক্সের ডিগ্রিতেও।

কেরিয়ার? ওয়ারশ' ফিরে স্কুলে শিক্ষকতা? তা-ই হয়তো হত, যদি-না এক অধ্যাপক আলাপ করাতেন বিশেষ এক জনের সঙ্গে। পিয়ের কুরি। অধ্যাপক। গবেষণা করেন চাপের প্রভাবে ক্রিস্টালের তড়িৎ উৎপাদন এবং চুম্বকত্বের ওপর উষ্ণতার প্রভাব নিয়ে। চিন্তায় ঘোর প্রতিষ্ঠানবিরোধী। পড়াশুনো বেশির ভাগ বাড়িতে। পিএইচ ডি-র পিছনে ছোটেনি। মারির বয়স ২৬। পিয়ের ৩৫। তবু প্রথম দর্শনে মারির মনে হল, পিয়ের যুবক, চোখেমুখে সারল্য, দৃষ্টি কিঞ্চিৎ, উদাসীন, আর হাসিটা ভরসা জোগায়।

জুলাই, ১৮৯৫। বিয়ে। দু'বছর পর জন্মাল প্রথম মেয়ে। আইরিন। সাত বছর পর দ্বিতীয় মেয়ে ইভ। মারি সহকর্মীদের নিন্দার শিকার। তিনি বাচ্চাদের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছেন ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণার সময় বটে সেটা! পদার্থবিজ্ঞানে চলেছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম রন্টজেন আবিষ্কার করেছেন এক বিচিত্র আলো, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ভেদ করে যায় অনেক কিছু। সে কেমনধারা আলো, তা অজানা, তাই রন্টজেন নাম দিয়েছেন 'এক্স-রে'। সে আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসি বিজ্ঞানী অঁরি বেকারেল পেয়েছেন আর এক খোঁজ। ইউরেনিয়াম মৌল আভা বা আলো ছড়ায়। আপনাআপনি। কেন? জানা নেই।

১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৭। রহস্যভেদে নামলেন মারি। সঙ্গী হলেন পিয়ের। ইউরেনিয়ামের আলো বিকিরণের নাম দিলেন ওঁরা। রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটি। আলো কেন? মারি বললেন, ওটা পরমাণুর ভেতরের খেলা। মারি-পিয়ের জানতে চান, শুধু ইউরেনিয়ামই কি আলো ছড়ায়? না কি তেমন মৌল আছে আরও? এটা-সেটা নিয়ে পরীক্ষা শেষে এক পদার্থ। পিচব্লেন্ডি। যা থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। কুরি দম্পতি দেখলেন, পিচব্লেন্ডি-র রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, ওই জিনিসে লুকিয়ে আছে ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য কোনও মৌল, যা ছড়ায় রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি। কী সেই মৌল? খোঁজ পেতে চলল মরিয়া চেষ্টা। আগুন জ্বালিয়ে পেল্লায় কড়াইতে মানুষ-সমান খুন্তি নেড়ে টন-টন পিচব্লেন্ডি গলিয়ে মৌল খোঁজা। দিন-রাত লাগাতার। পরিত্যক্ত এক ছাউনি *(এরপর দুয়ের পাতায়)*

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

(সংগৃহীত)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৬৬ সালের ২৯শে অক্টোবর বা বাংলা সন ধরলে ১২ই কার্তিক চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দলাল দেব ও মাতার নাম থাকমণি দেবী। তার প্রকৃত নাম দেওয়া হয়েছিল কেদারননাথ, ডাকনাম ছিল যোগী। এই ডাকনামেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। ওই জয়নগরের পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। কৈশোরে তাঁকে দেওঘরে পাঠানো হয়। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর আবার কলকাতায় পড়তে আসেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে এফ এ পরীক্ষায় বসতে পারেনি।

সংসার চালানোর জন্য তাকে ১৮৯১ সালে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয়। এই বছরেই মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে 'বিকাশ' ও 'দীপ্তি' নামক দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি অবশ্য শিশুদের জন্য লেখা ছিল না। সব বড়দের জন্য লেখা। তারপর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর ছোটদের জন্য লেখালেখি শুরু। তাঁর বই 'হাসি ও খেলা' নিয়ে সাধনা পত্রিকায় প্রশংসাসূচক আলোচনা করেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাতে যোগীন্দ্রনাথ সত্যিই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

পরে ১৮৯৫ সালে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আর এই 'মুকুল'-এর কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বশীল কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য স্কুল যেতে প্রায়শই দেরি হতো। ফলত মাইনে কাটা যেত। বাধ্য হয়ে তিনি মাস্টারির চাকরিটা ছাড়েন। কিন্তু সাহিত্য চর্চার সঙ্গে ব্যবসায়িক চিন্তার উদ্ভাবনে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন 'সিটি বুক সোসাইটি', তার নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা। ১৮৯৭ সালেই প্রকাশিত হয় তার বহু প্রচলিত বিখ্যাত বই 'হাসিখুশি।'

তারপর এই 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে তার জনপ্রিয় বইগুলি। এভাবেই একে একে তার 'খুকুমণির ছড়া', 'খেলার গান খেলার সাথী', 'ছোটদের চিড়িয়াখানা', 'ছোটদের মহাভারত', 'ছোটদের রামায়ণ', 'জানোয়ারের কাণ্ড', 'হাসির গল্প', 'হিজিবিজি'র মতো মোট প্রায় আশিটি বই বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

এইসব বই-পুস্তিকা পড়েই বাংলার কোটি কোটি শিশু বড় হয়েছে। এখনও হচ্ছে। তাই সংখ্যাটা লিখলাম। চার পাঁচটি ছ'টি প্রজন্ম ধরে নাগাড়ে ওই 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে' পড়ে আসছে। সেই ১৮৯৭ থেকে এই পড়া শুরু ধরলে আজ পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যাটা কোটি কোটি তো হবেই।

বাংলার কে-না তার সেইসব প্রাইমারি বা 'প্রাথমিক' বই পড়েছেন? ভাষাবিদ্ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মতো বিখ্যাত মনীষীরা তো তার লেখা পড়েছেন-ই, এমন সব মন্তব্য স্মৃতিচারণ করেছেন যে আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি, তার মূল্যায়ন করতে পারছি।

....

যুগের পর যুগ এসেছে, বদল ঘটেছে অনেক কিছুর। কিন্তু শিশুপাঠ্য হিসাবে 'হাসিখুশি'র প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। ইংরাজি মাধ্যম স্কুল বাদ দিলে প্রায় সব বাঙালি শিশুরাই বই খুলতে পারার বয়সেই পড়ে যোগীন্দ্রনাথের চিরন্তর ছড়াগুলি। অন্য আরও অনেক বইয়ের সঙ্গে কেউ কেউ পড়ে কেউ কেউ বা শুধুই 'হাসিখুশি', 'হাসি ও খেলা', 'ছড়া ও পড়া'।

তার আগে বাংলার শিশুদের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখে দিয়েছিলেন 'বর্ণ পরিচয়'। সে বই-ও আমাদের পড়তে হয়। এখনও হয়। আর ছিল বিদ্যাসাগরেরই বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লেখা প্রাথমিক 'শিশু শিক্ষা'। কিন্তু ওই বইগুলো মূলত গদ্যে লেখা, তাই শিশুমনে অত তাড়াতাড়ি গেঁথে যেত না।

কিন্তু 'হাসিখুশি' ছড়ার ছন্দে লেখা। আর এজন্যেই এত জনপ্রিয় যোগীন্দ্রনাথের ছড়াগুলি। জনপ্রিয় গ্রন্থাগার যোগীন্দ্রনাথ মহাশয়ও। শিশুশিক্ষায় তাঁর 'হাসিখুশি'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে এ সময়ের প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্য গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন : "...হাসিখুশিময় এই পাঠ আয়োজনে যোগীন্দ্রনাথ বর্ণ চেনানো, পড়তে শেখানো শুধু নয়, অঙ্ক কষাতেও তৎপর হয়েছেন। 'মামার বাড়ি' শিরোনামাঙ্কিত ছড়ায় শিখিয়েছেন যোগ, 'হারাধনের দশটি ছেলে' শীর্ষক ছড়ায় শিখিয়েছেন বিয়োগ। 'মামাদের পোষা মেনি যেন বড়লাট। সাত পশু এক মাছ—সাতে একে আট এইভাবে অনায়াসে যোগও হয়ে যায়। এর স্মৃতি জীবনভর থেকে যায়।

যোগীন্দ্রনাথের ছড়া-কবিতা-গল্প শিশুমনের উপযোগী। আর শিশুমন সারল্যে চিরন্তন। তার চিরকাল শিশুদের এসব ছড়া কবিতা ভালো লাগবে। লাগছেও; লাগবেও। এখনও যোগীন্দ্রনাথ তাই খুব খুব প্রাসঙ্গিক। আরও অনেকদিন তার এই প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকবে। কেন তা বজায় থাকবে তা কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর কাছ থেকেই জেনে নেবে। কবি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু 'বাংলার শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন : "...মুখে বোল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ছেলে তারই ছড়া আওড়ায়—সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরনতুন নান্দীপাঠ—মায়ের পরে পরেই তার মুখে-মুখে কথা শেখে শিশুরা। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর 'হাসিখুশি'র দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গীকৃত শুভ্র জীবনের রাশি রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর, হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিদ্যালয়। ঠিক তার পাশে নাম করতে পারি এমন বিদেশী লেখকের সন্ধান আজও পাইনি।"

যোগীন্দ্রনাথের সেই যুগ ছিল শিশুসাহিত্যের চরম উৎকর্ষের যুগ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী,

(এরপর দুয়ের পাতায়)

স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২২১২-৬৫০০/৭৩৩৫/৬৩৮৯